বসতি
(Settlement)

ইউনিট ৪

ভূমিকা

সুপ্রাচীনকালে মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে এবং আত্মরক্ষার্থে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে বেড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মানুষ একত্রিত হয়ে বসতি স্থাপন শুরু করেছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে বসতি স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সময়ের আবর্তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে গ্রামীণ এবং নগর বসতি। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও গ্রামীণ এবং নগর বসতির ধারা বিদ্যমান। এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করায় জাতীয় উন্নয়নে এর গুরুত্ব অপরিসীম। একইসাথে গ্রামীণ বসতির সাথে গ্রামীণ হাট ও বাজারসমূহ নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। গ্রামে বসবাসকারী মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল ভিত্তি কৃষি। অন্যদিকে, নগর এলাকায় বসবাসরত অধিবাসীদের অধিকাংশ অকৃষি পেশায় নিয়োজিত। নগর বসতির ঘরবাড়িগুলো গ্রামের তুলনায় উন্নত সরঞ্জাম দিয়ে তৈরি এবং নির্মাণশৈলীও ভিন্ন। এতে গ্রাম এবং শহর সহজেই চেনা যায়। বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকা যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে ঠিক তেমনি নগরায়নের মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে নগরায়নজনিত সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব সমস্যা সমাধান করে নগরায়নকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে। এই ইউনিটে বসতি, বসতির ধরণ, বসতি স্থাপনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব, বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য, হাট ও বাজার, নগরায়ন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

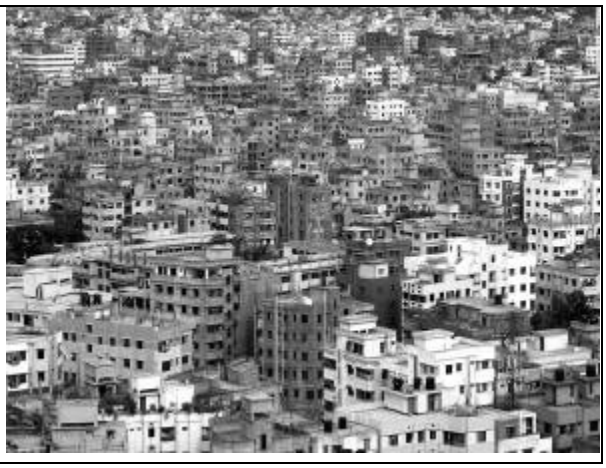

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : বসতি ও বসতির প্রকারভেদ
পাঠ-৪.২ : বসতি বিন্যাসে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব
পাঠ-৪.৩ : বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি
পাঠ-৪.৪ : বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট ও বাজার
পাঠ-৪.৫ : বাংলাদেশে নগরায়নের ধারা ও প্রধান নগরসমূহ
পাঠ-৪.৬ : বাংলাদেশের নগরায়নের সমস্যা ও সমাধান

ব্যবহারিক

পাঠ-৪.৭ : বাংলাদেশের প্রধান নগরসমূহ মানচিত্রে প্রদর্শন এবং নগর জনসংখ্যার ভিন্নতা বর্ণনাকরণ

পাঠ-৪.১ বসতি ও বসতির প্রকারভেদ (Settlement and Its Types)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বসতি বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- বসতির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

বসতি

মানুষ সামাজিক জীব। সুপ্রাচীনকাল থেকেই খাবার খেয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে এবং আত্মরক্ষার্থে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে বেড়িয়েছে। যখন মানুষ দেখলো যে বীজ বপন করে ফসল ফলানো যায় তখন থেকেই মানুষ ছুটাছুটি বন্ধ করে একস্থানে বসবাস করতে শিখে যায়। এটি সম্ভবত বসতির সূচনা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একইভাবে পরিবেশের সাথে মানুষের অভিযোজনের প্রথম পদক্ষেপ হলো বসতি স্থাপন। মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকূল অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে এবং প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বসতি গড়ে তোলে। অর্থাৎ সমাজবদ্ধ জীবনের প্রয়োজন থেকেই বসতির সৃষ্টি। তাই দেখা যায়, পথঘাটের অবস্থা নিয়ে বিভিন্ন আকার বা ধরনের গৃহে জনমণ্ডলীর সমাবেশ গড়ে উঠে। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো একটি স্থানে মানুষ একত্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে তাকেই বসতি বলে। Stone (১৯৬৫) এর মতে, "কোনো স্থানে এক বা একাধিক পরিবার বসবাস করাকে বসতি বলে"। Dickinson (১৯৩২) বসতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে-"বসতি হলো সেই স্থান যেখানে মানুষ বসবাস করে এবং বিভিন্ন প্রকার কাজ (যেমন-কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি) সম্পাদন করে"। সুতরাং বলা যায় যে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার উপর ভিত্তি করে মানুষ ঘরবাড়ি নির্মাণ করে যখন বসবাস করে তখন তাকে বসতি বলে। বসতিই সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই বসতির রূপ বিভিন্ন ধরনের। শীতপ্রধান দেশের বসতি ও গরম প্রধান দেশের বসতি কাঁচা বা পাকা যে কোনোটিই হতে পারে। আবার তুন্দ্রা জলবায়ুর শীতল আবহাওয়ায় এস্কিমোরা বরফের ঘরে তাদের বসতি স্থাপন করে। সময়ের সাথে সাথে বসতির ধরণ ও রূপ পরিবর্তন হয়। এভাবেই বিশ্বে গ্রাম ও নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

বসতির প্রকারভেদ (Types of Settlement) : গঠন বিন্যাস এবং কার্যাবলির উপর ভিত্তি করে বসতিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- গ্রামীণ বসতি এবং শহুরে বসতি। গ্রামীণ ও শহুরে বসতিকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নের ছকে বসতির প্রকারভেদ দেখানো হলো :

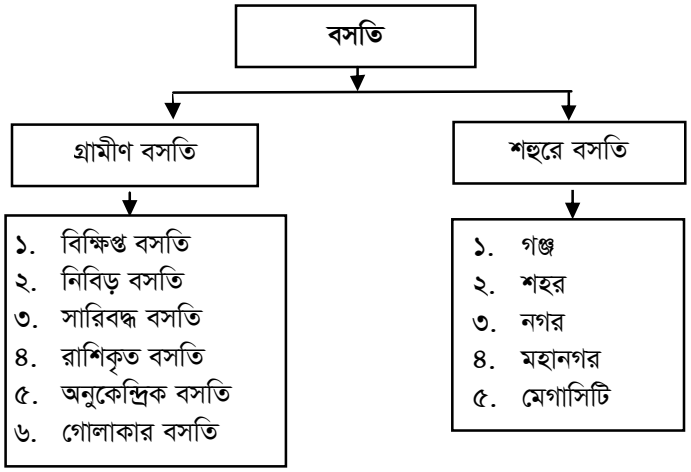

ক. গ্রামীণ বসতি (Rural Settlement) : যে বসতির অধিকাংশ জনগোষ্ঠির উপজীবিকা প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভরশীল সেই জনগোষ্ঠির বসতিকে গ্রামীণ বসতি বলা হয়। গ্রামীণ বসতির অধিবাসীরা সাধারণত কৃষিকাজ, পশুপালন, মৎস্য শিকার বা চাষ প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত থাকে। বিভিন্ন প্রকার গ্রামীণ বসতির ধরণ ও বৈশিষ্ট্যে নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. বিক্ষিপ্ত বসতি (Urban Settlement) : যখন কোনো বসতি কোনো নিয়ম না মেনে পরস্পর বেশ ব্যবধানে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে তখন তাকে বিক্ষিপ্ত বসতি বলে। এ ধরনের বসতি বিচ্ছিন্ন বসতি নামেও পরিচিত। বিক্ষিপ্ত বসতিতে একেকটি বাড়িতে দুইটি বা তিনটি ঘরের সমষ্টি থাকতে পারে। সাধারণত বৃষ্টিবহুল আর্দ্র অঞ্চলে পানির অভাব থাকে না বলে কৃষকেরা নিজ নিজ জমির সন্নিকটে বসবাস করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে উঠেছে। উন্নত দেশগুলোতেও এ ধরনের বসতি দেখা যায়। আবার অনেক সময় বনভূমি বা পার্বত্য অঞ্চলেও এরূপ বসতি দেখা যায়। এ ধরনের বসতির অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী।

২. নিবিড় বসতি (Nucleated Settlement) : কোনো স্থানে যখন প্রাকৃতিক পরিবেশ, পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য, উন্নত ও সুলভ পরিবহন ব্যবস্থা, পানির সহজলভ্যতা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সম্ভাবনা প্রভৃতি নিয়ামক অনুকূল থাকে, তখন সেখানে নিবিড় বসতি গড়ে উঠে। এ ধরনের বসতিকে পুঞ্জীভূত বা সন্নিবিষ্ট বসতিও বলা হয়। এ বসতি অঞ্চলে বসতবাড়ি খুবই ঘন এবং কিছুটা উন্নত উপকরণে তৈরি। অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিকতাবোধ খুব বেশি এবং জীবনযাত্রার মানও বেশ উন্নত। অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী হলেও অন্যান্য পেশাজীবির লোকজনও থাকে। এ বসতি অঞ্চলে স্কুল, ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা দেখা যায়।

৩. সারিবদ্ধ বসতি (Linear Settlement) : যে বসতি নদীর তীরবর্তী উঁচু ভূমি, রাস্তা বা রেলপথের উভয় পার্শ্বে অথবা উপকূলভাগে অবস্থিত কোনো বালিয়াড়ির পশ্চাতে সারিবদ্ধভাবে সরলরেখার ন্যায় গড়ে উঠে তাকে সারিবদ্ধ বসতি বলে। অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী হলেও নদী, সড়ক বা রেলপথে পণ্যদ্রব্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আদান-প্রদানের সুযোগ পায়। এ জাতীয় বসতির ধরণ সরল বা বক্ররেখার ন্যায় হয়ে থাকে। সারিবদ্ধ বসতি কখনো কখনো ৫ থেকে ৬ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

৪. রাশিকৃত বসতি (Accumulated Settlement) : যে বসতি বিভিন্ন রাস্তার সংযোগ স্থলে বা রাস্তা ও নদীর মিলন স্থলে গড়ে উঠে তাকে রাশিকৃত বসতি বলা হয়। যাতায়াত ও পরিবহনের সুবিধা থাকায় এ বসতি অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ প্রসার লাভ করে। এ বসতির অধিবাসীদের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি বাণিজ্যিক কার্যাদি।

৫. অনুকেন্দ্রিক বসতি (Semi Nucleated Settlement) : যে বসতির কেন্দ্রে এমন একটি সুবিধা বা ভূমি ব্যবহার থাকে যাকে কেন্দ্র করে বসতি গড়ে ওঠে। এ ধরনের বসতিকে অনুকেন্দ্রিক বসতি বলা হয়। ইউরোপের অনেক পুরানো বসতি রয়েছে যেগুলো একটি গীর্জাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের বিল ও ডোবা অঞ্চলে এ ধরনের বসতির প্রাধান্য দেখা যায়। এসব অঞ্চলে একটি উঠানকে কেন্দ্র করে অনুকেন্দ্রিক বসতি গড়ে উঠে।

৬. গোলাকার বসতি (Circular Settlement) : মরু অঞ্চলের কোনো ঝর্ণা বা হ্রদ বা অন্য কোনো আকর্ষণীয় স্থানের চারপাশে যে বসতি গড়ে উঠে তাকে গোলাকার বসতি বলা হয়। পূর্ব আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপের কোনো কোনো অঞ্চলে গবাদি পশুর খামারকে কেন্দ্র করে গড়ে এ জাতীয় বসতি দেখা যায়।

খ. নগর বসতি (Urban Settlement) : যে বসতি অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী প্রত্যক্ষ ভূমি ব্যবহার ব্যতীত অকৃষি পেশায় অর্থাৎ চাকুরি, শিল্প, পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, শিক্ষা, প্রশাসন প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে বসবাস করে তখন তাকে নগর বসতি বলে। নগর বসতিতে অনেক রাস্তাঘাট এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশালাকার বহুতল ভবন থাকে। এ বসতি অঞ্চলে সাধারণত বিদ্যুৎ, পানি, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকে। আকৃতি ও গঠন অনুসারে নগর বসতিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হলো-

১. গঞ্জ (Ganj) : কোনো বসতি যখন ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে তখন সে বসতিকে গঞ্জ বলা হয়। এ জাতীয় বসতিতে ক্রমেই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গঞ্জসমূহে আবাসিক এলাকা খুব একটা থাকে না।

২. শহর (Town): যে বসতি ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রশাসন, শিল্পকর্ম প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে তাকে শহর বসতি বলে। শহর বসতিতে বসবাসকারী মানুষের পেশায় বৈচিত্র্যতা থাকে। শহরে সাধারণত ১ লক্ষের কম লোক বাস করে। শহর ব্যবস্থাপনার জন্য কমিটি বা স্থানীয় সরকার থাকে। এগুলোকে পৌরসভা বলা হয়। সাধারণত বড় কোনো গঞ্জ, নদীবন্দর বা হাট শহরে পরিণত হয়।

৩. নগর (City) : অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শহর বসতিকে নগর বসতি বলা হয়। সাধারণত ১ লক্ষের অধিক লোকের আবাসস্থলকে নগর বলা হয়। বিভিন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকার ফলে শহর প্রসারিত হয়ে নগরে পরিণত হয়। নগর ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার নিয়োজিত থাকে এবং সরকার সেবা প্রদান করে।

৪. মহানগর (Metropolis): জনসংখ্যা ১ মিলিয়নের উপর। মহানগর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে সিটি কর্পোরেশন বলা হয়। যেমন-চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রংপুর প্রভৃতি। মহানগরের আয়তন, প্রভাব বলয়, কর্মক্ষেত্র, প্রশাসনিক ক্ষমতা নগর অপেক্ষা অধিক। নগর অপেক্ষা মহানগরে কর্মবৈচিত্র্যতা অধিক।

৫. মেগাসিটি (Mega City) : কোনো নগরের জনসংখ্যা যখন ৫ মিলিয়নের অধিক হয় তখন তাকে মেগাসিটি বলে। গঞ্জ, শহর, নগর, মহানগর অপেক্ষা মেগাসিটির পরিধি, প্রভাব বলয়, কর্মবৈচিত্র্যতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা, কর্মব্যস্ততা, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা অধিক থাকে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মেগাসিটি। তবে এখানে ধারণ ক্ষমতার অধিক জনসংখ্যা বসবাস করছে।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, উপরিউক্ত আলোচনা হতে আমরা বসতি সম্পর্কে জানলাম। পরের পাঠে বসতি বিন্যাসে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বসতির শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

বসতি বলতে কোনো স্থানে মানুষ একত্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করাকে বুঝায়। গঠণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বসতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-গ্রামীণ বসতি এবং নগর বসতি। গ্রামীণ বসতি হলো, যে বসতির অধিকাংশ জনগোষ্ঠির উপজীবিকা প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভরশীল সেই জনগোষ্ঠির আবাসস্থল। এখানকার মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। অন্যদিকে, যে বসতি অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী প্রত্যক্ষ ভূমি ব্যবহার ব্যতীত অকৃষি পেশায় অর্থাৎ চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে বসবাস করে তখন তাকে নগর বসতি বলে। নগর বসতিতে গ্রামীণ বসতির তুলনায় সুযোগ-সুবিধা অধিক থাকে। এছাড়া ঘরবাড়ির অবকাঠামোগত পার্থক্য থাকে। যা দেখে সহজেই গ্রাম এবং নগর নির্ণয় করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বসতিকে প্রধানত কতভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ থেকে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মি. জেমস গ্রামে বসবাস করেন। তিনি শহরে প্রথম ঘুরতে এসে দেখলেন, এখানকার মানুষের ঘরবাড়ি, পেশা, জীবনযাত্রা গ্রামের চেয়ে ভিন্ন ধরনের। তিনি গ্রাম এবং শহরের পার্থক্য জানার জন্য তার শহরের এক বন্ধুর কাছে গেলেন। এরপর বন্ধুর কাছে গ্রাম এবং শহরের পার্থক্য সম্পর্কে জানলেন।

২। পরিবেশের সাথে মানুষের অভিযোজনের প্রথম পদক্ষেপ কোনটি?
(ক) মৎস্য শিকার (খ) পশুশিকার (গ) বসতি স্থাপন (ঘ) আগুনের আবিষ্কার

৩। গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
i. ফসল উৎপাদন ii. মৎস্য শিকার iii. কাঁচা ঘরবাড়ির আধিক্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। তুন্দ্রা অঞ্চলের শীতল জলবায়ুতে এস্কিমোরা কী দিয়ে ঘর নির্মাণ করে?
(ক) ইট-সিমেন্ট (খ) বরফ (গ) টিন (ঘ) মাটি

৫। মেগাসিটির জনসংখ্যা কত?
(ক) ৫ মিলিয়নের অধিক (খ) ৬ মিলিয়নের অধিক (গ) ৭ মিলিয়নের অধিক (ঘ) ৮ মিলিয়নের অধিক

পাঠ-৪.২ বসতি বিন্যাসে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব (Influence of Geographical Environment on Settlement Distribution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বসতি বিন্যাসে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

বসতি বিন্যাসে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

কোনো স্থানে বসতি স্থাপনে ভৌগোলিক পরিবেশ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। বসতি স্থাপনের ধরণ এবং প্রক্রিয়া নির্ভর করে ভৌগোলিক পরিবেশের উপর। পৃথিবীর সর্বত্র ভৌগোলিক পরিবেশ একই রকম না হওয়ায় মানুষ সবসময় পছন্দমতো জায়গায় বসতি স্থাপন করতে পারে না। কোনো স্থানে বসতি স্থাপন করতে হলে সেখানকার ভৌগোলিক পরিবেশের নিয়ামকসমূহ মনুষ্য বসবাসের অনুকূল থাকতে হয়। ভৌগোলিক পরিবেশকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ।

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment) : প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে প্রকৃতি সৃষ্ট পরিবেশকে বুঝায়। পরিবেশের প্রধান অংশই হলো প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশের অসংখ্য নিয়ামক রয়েছে। এসব নিয়ামকের মধ্যে কিছু কিছু নিয়ামক রয়েছে যেগুলো মানব বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে বসতি স্থাপনের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান নিয়ামকগুলো আলোচনা করা হলো :

১. ভূ-প্রকৃতি (Physiography) : কোনো স্থানে জনবসতি গড়ে উঠার ক্ষেত্রে ভূ-প্রকৃতি ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। পার্বত্য এলাকা অসমতল হওয়ায় কৃষিকাজ তেমন হয় না বললেই চলে এবং যাতায়াত ব্যবস্থাও কঠিন। ফলে পার্বত্য অঞ্চলে তেমন কোনো বসতি গড়ে উঠেনা। অন্যদিকে, উচ্চ মালভূমি অঞ্চলেও মানব বসতি দেখা যায় না। তবে ১,০০০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট মালভূমিতে মানব বসতি গড়ে উঠেছে। যেমন-ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপের মধ্যে সমতল ভূমি মানব বসতি স্থাপনের আদর্শ। পৃথিবীর অধিকাংশ বসতি সমতল ভূমিতে গড়ে উঠেছে।

২. জলবায়ু (Climate) : পৃথিবীর সর্বত্র জলবায়ু একই রকম নয়। কোথাও উষ্ণ, কোথাও আর্দ্র, কোথাও নাতিশীতোষ্ণ আবার কোথাওবা সারা বছর বরফে আচ্ছন্ন থাকে। অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল জলবায়ু অঞ্চল বসতি স্থাপনের অনুকূল নয় বলে সাধারণত বসতি গড়ে উঠে না। যেমন- গ্রীণল্যান্ডে কোনো মানব বসতি গড়ে উঠেনি। পক্ষান্তরে, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল মানব বসতি স্থাপনের উপযোগী বলে সহজেই বসতি গড়ে উঠে।

৩. সুপেয় পানি (Pure Water) : মানুষের জীবনধারনের জন্য আবশ্যকীয় নিয়ামক সুপেয় পানি। যে সকল স্থানে পানির উৎস রয়েছে বা পানি সহজলভ্য সেসব স্থানে বসতি গড়ে উঠে। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোও পানির উৎসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেমন-নীলনদকে কেন্দ্র করে মিশরীয় সভ্যতা। মরুভূমি অঞ্চলে ঝর্ণা বা প্রাকৃতিক কূপের চারদিকে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে বসতি গড়ে তোলে। বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চল ব্যতীত প্রায় সর্বত্রই পানি সহজলভ্য হওয়ায় সহজেই বসতি স্থাপন করা যায়।

৪. মৃত্তিকা (Soil) : মৃত্তিকার উর্বরতা বা অনুর্বরতা উপর বসতি স্থাপন অনেকাংশে নির্ভরশীল। উর্বর মৃত্তিকা ফসল উৎপাদনের উপযোগী হওয়ায় বসতির ঘনত্ব বেশি হয়। অনুর্বর মৃত্তিকা ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী হওয়ায় মানব বসতি কম দেখা যায়। মৃত্তিকার প্রভাবে জার্মান, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশে বিক্ষিপ্ত বসতি দেখা যায়।

৫. সূর্যালোক (Sunlight) : যেসব অঞ্চলে খুব বেশি বা কম সূর্যালোক পাওয়া যায় সেসব অঞ্চলে কৃষিকাজ ভালো হয় না। এ কারণে মরু বা মেরু অঞ্চল অপেক্ষা ক্রান্তীয় অঞ্চলে অধিক বসতি স্থাপিত হয়।

৬. বনাঞ্চল (Forest) : বনভূমির অবস্থান বসতি স্থাপনে প্রভাব বিস্তার করে। বনাঞ্চলে সাধারণত ছড়ানো জনবসতি অধিক দেখা যায়। বন যত গভীর হয় জনবসতিও তত বেশি ছড়ানো থাকে। যেমন-সুন্দরবনে জনবসতি অনেক কম।

খ. সামাজিক পরিবেশ (Social Environment) : মানুষ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করে যে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে তাই হলো সামাজিক পরিবেশ। মানব বসতি স্থাপনে সামাজিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক পরিবেশের প্রধান নিয়ামকগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. অর্থনীতি (Economy) : মানব বসতি স্থাপনে অর্থনৈতিক নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের যেসব অঞ্চলে প্রাকৃতিক বা খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে সেসব অঞ্চলে মানব বসতি দ্রুত প্রসারিত হয়। অধিকাংশ মানুষ কৃষি, প্রাকৃতিক বা খনিজ সম্পদভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অর্থাৎ যেসব এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ থাকে সেখানে বসতি গড়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২. সামাজিক বিভিন্নতা (Social Differentiation) : সমাজে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ বা গোত্রের লোক বসবাস করে। এসব মানুষের আচার-আচরন, রীতি-নীতি বা ভাবধারায় ভিন্নতা থাকে। ফলে সামাজিক বিভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন বসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়।

৩. যোগাযোগ (Communication) : যেসব এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ এবং সুলভ সেসব এলাকায় দ্রুত বসতি বিস্তার লাভ করে। যেমন-নদী তীরবর্তী অঞ্চলে নৌ-যোগাযোগ সহজ ও সুলভ হওয়ায় পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে উঠে।

৪. সংস্কৃতি (Culture) : সাধারণত একই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ একত্রে বসবাস করতে চায়। যেমন- পাহাড়ি জনগোষ্ঠি এক জায়গায়, সমতলের জনগোষ্ঠি আরেক জায়গায় বসতি স্থাপন করতে আগ্রহী হয়।

৫. নিরাপত্তা (Security) : বসতি স্থাপনে নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাচীনকালে মানুষ প্রতিরক্ষা সুবিধার জন্য পুঞ্জীভূত বসতি স্থাপন করতো। বর্তমানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় বসতি স্থাপনে মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করছে। এর ফলে বিক্ষিপ্ত বা ছড়ানো বসতি গড়ে উঠা সহজ হয়েছে।

৬. রাজনীতি (Politics) : রাজনৈতিক কারণেও অনেক সময় বসতি গড়ে উঠে বা পরিবর্তিত হয়। রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল হলে স্বাচ্ছন্দে বসতি গড়ে তোলা যায়। অন্যদিকে, রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলে অনেক সময় বসতি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং মানুষ অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ে বসতি গড়ে তোলে। সুতরাং বলা যায়, বসতি স্থাপনে রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করে।

৭. নির্মাণ সামগ্রী (Construction Materials) : নির্মাণ সামগ্রীর সহজলভ্যতা বসতি স্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৮. পশুচারণ (Animal Rearing) : পশুচারণের জন্য বিস্তৃত এলাকা প্রয়োজন হয় বলে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। সাধারণত নিজেদের সুবিধার জন্য এ ধরনের বসতি গড়ে উঠে।

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বসতি স্থাপনে ভৌগোলিক পরিবেশের নিয়ামকগুলো বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। তবে কোনো একক নিয়ামক বসতি স্থাপনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। ভৌগোলিক পরিবেশের নিয়ামকগুলো সম্মিলিতভাবে বসতি বিন্যাসে প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বসতি স্থাপনের ভৌগোলিক নিয়ামকসমূহ ছকবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক পরিবেশের উপর বসতি বিন্যাস নির্ভরশীল। ভৌগোলিক পরিবেশকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশের নিয়ামকসমূহের মধ্যে ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, পানির সহজলভ্যতা, মৃত্তিকা, সূর্যালোক, বনাঞ্চল অন্যতম। এসব নিয়ামক অনুকূল হলে সহজেই বসতি স্থাপন করা যায়। অন্যদিকে, সামাজিক পরিবেশের নিয়ামকসমূহের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক বিভিন্নতা, যোগাযোগ, সংস্কৃতি, প্রতিরক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি। কোনো একটি নিয়ামক এককভাবে বসতি বিন্যাসকে প্রভাবিত করতে পারেনা। অর্থাৎ প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের নিয়ামকগুলো সম্মিলিতভাবে কোনো এলাকার বসতি বিন্যাসে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভৌগোলিক পরিবেশের নিয়ামকসমূহকে কতভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি কোথায় অবস্থিত?
(ক) দক্ষিণ আফ্রিকা (খ) ব্রাজিল (গ) ভারত (ঘ) মালয়েশিয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ থেকে ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

রবি এবং শামীম বসতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানতে পারলেন, ইচ্ছা করলেই যে কোনো স্থানে বসতি স্থাপন করা যায়না। উদাহরণ হিসেবে তারা হিমালয় পর্বত, দুর্গম মরু অঞ্চল প্রভৃতির কথা চিন্তা করলেন।

৩। মানব বসতি স্থাপনে আদর্শ ভূ-প্রকৃতি কোনটি?
(ক) মালভূমি (খ) সমভূমি (গ) পর্বত (ঘ) জলাভূমি

৪। প্রাকৃতিক পরিবেশের নিয়ামক কোনটি?
i. অর্থনীতি ii. ভূ-প্রকৃতি iii. জলবায়ু
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৩ বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি (Rural Settlement in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন এবং
- গ্রামীণ বসতির ধরণ বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি

আমরা পাঠ ৪.১ এ জেনেছি, প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে যে বসতি গড়ে উঠে তাই হলো গ্রামীণ বসতি। বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি স্থাপনে যেসব নিয়ামক প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকার উর্বরতা, ভূমির মালিকানা, যোগাযোগ, পানির সহজলভ্যতা, জনসংখ্যার ঘনত্ব ইত্যাদি। এদেশের গ্রামীণ বসতিগুলো অনেকটাই পরিকল্পনাহীন। এ ধরনের বসতি গড়ে উঠার পর থেকে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Rural Settlement in Bangladesh) : বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

১. অধিকাংশ জনগণ কৃষির উপর নির্ভরশীল।
২. সুনির্দিষ্ট আকার ও আয়তন নেই। তবে নির্দিষ্ট একটি প্যাটার্ন রয়েছে।
৩. যৌথ পরিবারের আধিক্য রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৪. গ্রামীণ ঘরবাড়িগুলোর মধ্যে অধিকাংশ কাঁচা। ঘরগুলো বাঁশ, বেত, ছন, পাতা বা মাটির তৈরি। তবে আর্থ- সামজিক অবস্থা উন্নয়ন ও নির্মাণ সামগ্রীর সহজলভ্যতার ফলে টিন, পাকা, আধা পাকা ঘরের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৫. গ্রামীণ বসতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দরিদ্র কৃষিক। শ্রমিকদের একটি অংশ কর্মের সন্ধানে অন্যত্র গমন করে।
৬. গ্রামীণ বসতির অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সহজ-সরল।
৭. যে কোনো প্রতিবেশীর বিপদে দ্রুত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।
৮. রাস্তাগুলো সরলরেখায় না হয়ে আঁকাবাঁকা হয়।
৯. গ্রামীণ বসতি এলাকায় মাঠের পর মাঠে সবুজ ফসলের সমারোহ দেখা যায়।
১০. বসতবাড়ির সামনে বহিরাঙ্গন, চারপাশে গাছপালা ইত্যাদি থাকে।
১১. খোলা প্রান্তর, খেলার মাঠ দেখা যায়।
১২. প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গোয়ালঘর, উঠান থাকে।
১৩. সামাজিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল।
১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, হাসপাতাল প্রভৃতির অপর্যাপ্ততা দেখা যায়।
১৫. প্রতিটি বসতি কোনো না কোনো সেন্ট্রাল প্লেস বা সেবাকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। এই সেবাকেন্দ্রসমূহ ক্রমমান অনুযায়ী বড়-ছোট হয়ে থাকে। সাধারণত হাটবাজার, গঞ্জ, শহর, নগর, মহানগর এসব সেবাকেন্দ্র। এসব কেন্দ্র গ্রামীণ বসতির সাথে সম্পৃক্ত।

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির ধরণ (Pattern of Rural Settlement in Bangladesh) : বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতিকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা যায়।

১. রৈখিক বসতি (Linear Settlement) : যে বসতির বাড়িগুলো নদী তীরবর্তী উচু স্থান, নদীর প্রাকৃতিক বাঁধ, পুরাতন নদীর কিনারা, রাস্তার কিনারা প্রভৃতি স্থানে গড়ে উঠে তাকে রৈখিক বসতি বলে (চিত্র ৪.৩.১)। এ ধরনের বসতিগুলোর মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা জায়গা থাকে। এই ফাঁকা জায়গা কৃষি খামার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের বসতি অপরিণত ব-দ্বীপ অঞ্চল, পরিণত ব-দ্বীপের নিম্নাঞ্চল এবং সক্রিয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে

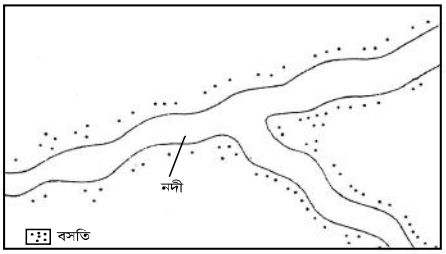

চিত্র ৪.৩.১ : রৈখিক বসতি

দেখা যায়। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, মহানন্দা প্রভৃতি নদীর অববাহিকা এবং হাওড় অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত। সিলেট, চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের পাদদেশেও রৈখিক বসতি দেখা যায়। রৈখিক বসতিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- সরল রৈখিক এবং বক্র রৈখিক।

ক. সরল রৈখিক বসতি : যে রৈখিক বসতি নদীর তীর, প্রবাহিত জলধারা এবং রাস্তার পাশে সমান্তরালভাবে গড়ে উঠে, তাকে সরল রৈখিক বসতি বলে (চিত্র ৪.৩.২)।

খ. বক্র রৈখিক বসতি : যে রৈখিক বসতি শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট নদী এবং রাস্তার বক্রতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে, তাকে বক্র রৈখিক বসতি বলে (চিত্র ৪.৩.৩)।

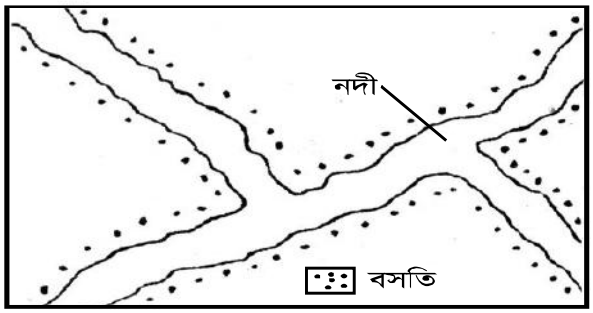

চিত্র ৪.৩.২ : সরল রৈখিক বসতি

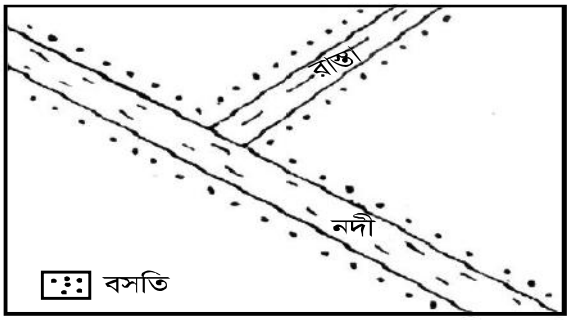

চিত্র ৪.৩.৩ : বক্র রৈখিক বসতি

২. বিক্ষিপ্ত বসতি (Dispersed Settlement) : যে বসতিতে দুই থেকে তিনটি ঘরের সমষ্টি এবং একটি বা দুইটি পরিবারের ৫ থেকে ৭ জনের আবাসনস্থল হিসেবে গড়ে উঠে তাকে বিক্ষিপ্ত বসতি বলে (চিত্র ৪.৩.৪)। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া প্লাবন সমভূমির প্রায় সর্বত্র বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে উঠেছে। এ বসতিগুলো বিশেষ কোনো নিয়ম মেনে গড়ে উঠেনা। এ ধরনের বসতি কৃষিজমির সুবিধা অনুযায়ী বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠে। এদেশের মধ্যম উচু এবং নিম্ন সমভূমিতে এ ধরনের বসতি দেখা যায়। রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, নোয়াখালী, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় বিক্ষিপ্ত বসতি অধিক রয়েছে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও ধলেশ্বরীর প্লাবন সমভূমি, সিলেটের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, চট্টগ্রাম অঞ্চলের নিম্ন সমতলভূমি, বিল এলাকা প্রভৃতিতে এ ধরনের বসতি দেখা যায়।

৩. পুঞ্জীভূত বা নিবিড় বসতি (Nucleated Settlement): যে বসতির অনেকগুলো ঘরবাড়ি পরস্পর কাছাকাছি অবস্থান করে তাকে পুঞ্জীভূত বসতি বলে (চিত্র ৪.৩.৫)। এ ধরনের বসতি আকারে ছোট হতে পারে এবং এর রূপ বিভিন্ন ধরনেরও হতে পারে। সামাজিক এবং ধর্মীয় কারণেও পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে তোলে। কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর, বরেন্দ্র অঞ্চল, মধুপুর গড়ে পুঞ্জীভূত বসতি দেখা যায়।

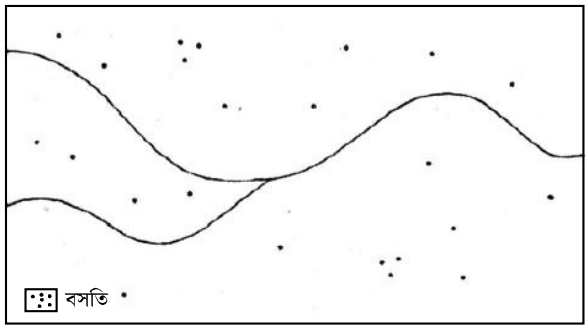

চিত্র ৪.৩.৪ : বিক্ষিপ্ত বসতি

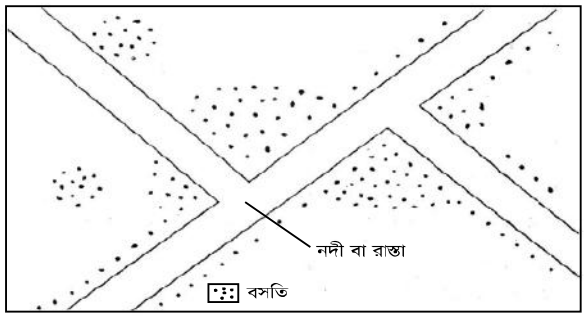

চিত্র ৪.৩.৫ : পুঞ্জীভূত বসতি

৪. অনুকেন্দ্রিক বসতি (Semi Nucleated Settlement) : অনুকেন্দ্রিক বসতি নদীতীর, রাস্তার মিলনস্থল, প্রসিদ্ধ স্থান, পাহাড়ের পাদদেশ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে (চিত্র ৪.৩.৬)। এর ধরনের বসতিতে পরস্পর জাতি গোষ্ঠি, একই উঠান এবং অন্যান্য সুবিধা নিয়ে অনেকগুলো ঘরবাড়ি গড়ে উঠে। সিলেটের হাকালুকি, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের জলাভূমি, রাজশাহীর চলনবিল ও মান্দা থানা, আড়িয়াল বিল, বাগেরহাট, যশোর প্রভৃতি এলাকায় অনুকেন্দ্রিক বসতি দেখা যায়।

৫. বিচ্ছিন্ন বসতি (Scattered Settlement) : বিচ্ছিন্ন বসতি বলতে এমন বসতিকে বুঝায় যেখানে একটি বসতি থেকে আরেকটি বসতি বেশ দূরে অবস্থান করে (চিত্র ৪.৩.৭)। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল, রংপুর ও দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন বসতি দেখা যায়। এ ধরনের বসতিতে পুরুষেরা কৃষিকাজ করে এবং হাট ও বাজারে একে অন্যের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। তবে মেয়েরা তেমন বের হওয়ার সুযোগ পায় না বলে অনেকটা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে।

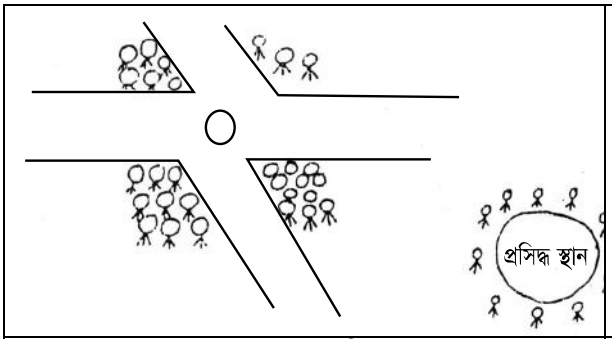

চিত্র ৪.৩.৬ : অনুকেন্দ্রিক বসতি

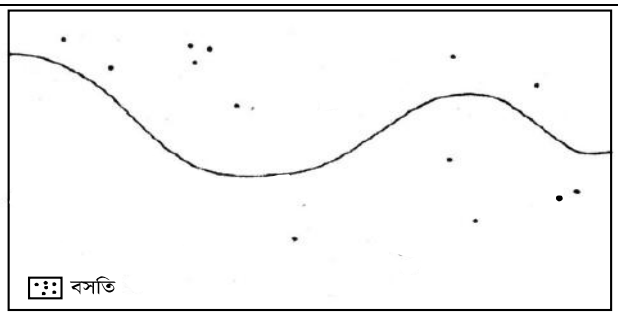

চিত্র ৪.৩.৭ : বিচ্ছিন্ন বসতি

৬. গোলাকার বসতি (Circular Settlement) : যখন কোনো এলাকায় পানির উৎসকে কেন্দ্র করে বসতি গড়ে উঠে তখন তাকে গোলাকার বা বৃত্তাকার বসতি বলে। আমাদের দেশের বিল বা হাওড় অঞ্চলে কোথাও কোথাও এ ধরনের বসতি রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত। অধিকাংশ লোক গ্রামে বসবাস করে। গ্রামীণ বসতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো অধিকাংশ লোক কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। ঘরবাড়িগুলো বাঁশ, ছন, খড়, মাটি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে টিনের, আধা পাকা, সেমি পাকা, পাকা ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এদেশের গ্রামীণ বসতিগুলোকে গঠন কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- রৈখিক বসতি, বিক্ষিপ্ত বসতি, বিচ্ছিন্ন বসতি, নিবিড় বসতি। এদেশের পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত প্রায় সর্বত্র বসতি স্থাপনে ভৌগোলিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। অনুকেন্দ্রিক বসতি কোথায় দেখা যায়?
(ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম (গ) বাগেরহাট (ঘ) রংপুর

২। বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
i. সুনির্দিষ্ট আকার ও আয়তন নেই ii. জীবনযাত্রা সহজ-সরল
iii. সবুজ ফসলের সমারোহ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও i

৩। রৈখিক বসতি কোথায় দেখা যায়?
i. নদী তীরবর্তী উঁচু স্থানে ii. রাস্তার কিনারে iii. বনভূমি অঞ্চলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৪ বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট ও বাজার (Rural Hat-Bazar in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গ্রামীণ হাট ও বাজার কাকে বলে তা জানবেন;
- গ্রামীণ হাট ও বাজারের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন এবং
- গ্রামীণ হাট ও বাজারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট ও বাজার

বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার চিরায়ত দৃশ্য হাট ও বাজার। এটি গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। গ্রামের মানুষ উৎপাদিত কৃষিপণ্যের অতিরিক্ত অংশ এসব হাট ও বাজারে বিক্রি করে থাকে। যা দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী মানুষের চাহিদা পূরণ করে। অপরদিকে, গ্রামের মানুষ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হাট ও বাজার থেকে ক্রয় করে। এদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে হাট ও বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি হাট ও বাজার সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক মিলন কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে। গ্রামীণ সমাজ জীবনে হাট ও বাজারের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো অঞ্চলে হাট ও বাজার গড়ে উঠার পিছনে সেই অঞ্চলের অবস্থান, মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ামক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। এসব হাট ও বাজার নিম্নমানের সেবাকেন্দ্র বা সেন্ট্রাল প্লেস।

গ্রামীণ হাট ও বাজার : গ্রামীণ হাট ও বাজার এমন একটি নির্দিষ্ট স্থান যেখানে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ নিজেদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় এবং প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে পারে। অর্থাৎ- গ্রামীণ হাট ও বাজারে মানুষ প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য বিনিময় করতে পারে। তবে হাট ও বাজার শব্দ দুটি ভিন্ন অর্থ এবং কার্য বহন করে। হাট বলতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্ধারিত স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতার একটি সমাবেশ। নির্দিষ্ট দিন ছাড়া অন্যান্য দিন হাটের স্থান সাধারণত ফাঁকা থাকে। অন্যদিকে, বাজার হচ্ছে দৈনন্দিন পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের স্থান। এখানে প্রতিদিন সীমিত পরিসরে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় দেখা যায়। এ ধরনের বাজারে হাট অপেক্ষা কম ক্রেতা-বিক্রেতা থাকে। ফলে বাজার আকারে ছোট হয়। বাজারে মানুষ সাধারণত দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যই ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এখানে দ্রুত পচনশীল পণ্য সরবরাহের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে অধিকাংশ গ্রামীণ এলাকাতে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাওয়ায় এসব বাজার রাত পর্যন্ত জমজমাট থাকে। এছাড়া মোবাইল ফোন এবং প্রযুক্তি ব্যবহার গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ্রামীণ হাটের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Rural Hat) : সব গ্রামে হাট না থাকলেও বৃহৎ গ্রামে হাট দেখা যায়। অনেক সময় কয়েকটি গ্রামকে কেন্দ্র করে একটি হাট গড়ে উঠে। নিম্নে গ্রামীণ হাটের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো:

১. গ্রামীণ হাট সাধারণত সপ্তাহে ১ বা ২ দিন বসে।
২. আশেপাশের গ্রামগুলোর লোকজনের যাতায়াতের সুবিধা বিবেচনা করে সুবিধাজনক স্থানে গড়ে উঠে।
৩. হাটের দিন আকার বড় হয় এবং অধিক লোক সমাগম হয়।
৪. পাইকারি ও খুচরা পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।
৫. দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতা-বিক্রেতার আগমন ঘটে।
৬. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।
৭. বেশিরভাগ হাটে অস্থায়ী কাঁচা ঘর থাকে। তবে বড় বড় হাটে স্থায়ী অবকাঠামোও দেখা যায়।
৮. নিকটবর্তী দুইটি হাট একই দিন বসে না। এক্ষেত্রে উভয় হাটের কর্তৃপক্ষ সমঝোতার মাধ্যমে দিন ঠিক করে থাকে।
৯. বড় হাটগুলেতে একেকটি পণ্যের জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্দিষ্ট করা থাকে। যেমন- গরু, ছাগল, ধান, পাট ইত্যাদির জন্য জায়গা নির্ধারণ করা থাকে।
১০. শাকসবজি, ফলমূল, চা, বিড়ি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য চট, পলিথিন ইত্যাদি দ্বারা অস্থায়ী ছাউনি বা উন্মুক্ত থাকে।

১১. উন্মুক্ত জায়গায় খোলামেলা পরিবেশে স্বত:স্ফুর্তভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগম ঘটে।
১২. গ্রামীণ হাট সাধারণত দুপুরের পরে বসে।
১৩. কোনো বিশেষ ঘোষণা বা বার্তা থাকলে তা ঢোল পিটিয়ে হাটে প্রচার করা হয়।

গ্রামীণ বাজারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Rural Bazar) : গ্রামীণ বাজারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-
১. সাধারণত গ্রামীণ রাস্তার পাশে বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।
২. প্রতিদিন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে থাকে।
৩. কিছু কিছু স্থায়ী দোকানঘর দেখা যায়।
৪. সকালে শুরু হয়ে রাতে শেষ হয়। মহাসড়কের পাশে গ্রামীণ বাজার গভীর রাত পর্যন্ত খোলা থাকে।
৫. সাধারণত পচনশীল পণ্যদ্রব্য যেমন- মাছ, মাংস, শাকসবজি, দুধ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়। এছাড়া নিত্য ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্য যেমন-তেল, চিনি, সাবান ইত্যাদি পাওয়া যায়।
৬. গ্রামীণ মানুষের চাহিদা বিবেচনা করে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।
৭. গ্রামীণ বাজার কর্মজীবি মানুষের প্রতিদিনের বিনোদনের মিলন কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ্রামীণ হাট ও বাজারের গুরুত্ব : বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে। গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের অন্যতম উপায় হাট ও বাজার। এটি গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রাকে বহুভাবে প্রভাবিত করে। নিম্নে গ্রামীণ হাট ও বাজারের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বসমূহ তুলে ধরা হলো:

১. কেন্দ্রীয় স্থান : সাধারণত যাতায়াত এবং পণ্যদ্রব্য আনা-নেওয়ার সুবিধা বিবেচনা করে গ্রামের কোনো কেন্দ্রীয় স্থান হাট ও বাজারের জন্য নির্ধারণ করা হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো পার্শ্ববর্তী একাধিক ক্রেতা-বিক্রেতাকে আকৃষ্ট করা।

২. পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় : গ্রামের মানুষ কৃষি উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যে নিজের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ হাট ও বাজারে বিক্রয় করে। বিশেষ করে পচনশীল পণ্যদ্রব্য দ্রুত বিক্রয় করতে হয়। এক্ষেত্রে হাট ও বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পক্ষান্তরে, প্রয়োজনীয় পণ্য গ্রামের হাট ও বাজার থেকে ক্রয় করে থাকে। এতে গ্রামীণ মানুষ আর্থিক এবং সময়ের দিক থেকে সাশ্রয়ী হয়।

৩. অর্থনৈতিক : গ্রামীণ হাট ও বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে গ্রামের মানুষ যে অর্থ আয় করে তা দিয়ে অন্যান্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে এবং অবশিষ্ট অর্থ সঞ্চয় করে। অর্থাৎ গ্রামের মানুষের অর্থনীতির চাকা আবর্তিত হয় হাট ও বাজারকে কেন্দ্র করে। গ্রামীন অর্থনীতির ভিত্তি সুসংহত হলে তা জাতীয় অর্থনীতিকে গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪. পণ্যদ্রব্যের আন্ত:বিনিময় : পণ্যদ্রব্যের আন্ত:বিনিময়ের অন্যতম মাধ্যম হাট ও বাজার। অনেক পণ্যদ্রব্য রয়েছে যেগুলো গ্রামে উৎপাদিত হয় না। যেমন-তেল, চিনি, লবণ, সাবান, ঔষধ, হাড়ি, পাতিল, শাড়ি, কাপড়, জুতা ইত্যাদি। গ্রামীণ মানুষের এসব পণ্যদ্রব্যের চাহিদা পূরণ করা হয় গ্রামীণ হাট ও বাজারে আন্ত:বিনিময়ের মাধ্যমে।

৫. বিশেষ পণ্যদ্রব্যের চাহিদা পূরণ : গ্রামের মানুষের বিশেষ চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে ব্যবসায়ীগণ পণ্য সরবরাহ করে থাকে। এতে গ্রামের মানুষ সহজেই হাট ও বাজার থেকে এসব পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে পারে।

৬. পণ্যদ্রব্যের সমাহার : গ্রামের কৃষকের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের উদ্বৃত্ত অংশ হাট ও বাজারের মাধ্যমে শহরসহ সারা দেশে এমনকি বিদেশেও পৌঁছায়। এছাড়া দুর্গম অঞ্চল বা যেসব অঞ্চলে পণ্যঘাটতি থাকে সেখানে গ্রামীণ হাট ও বাজার থেকে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে সরবরাহ করা হয়। এতে করে দেশের সর্বত্র কৃষিপণ্যের সুষম বন্টন নিশ্চিতে গ্রামীণ হাট ও বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একই সঙ্গে গ্রামীণ ঐসব পণ্যদ্রব্যের প্রসার ঘটে এবং কৃষক লাভবান হয়।

৭. বহুমুখী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র : গ্রামীণ হাট ও বাজার পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের পাশাপাশি বহুমুখী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। কারো সঙ্গে যোগাযোগ করা, জমিজমা ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়াদি, রাজনৈতিক সভা ও সমাবেশ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড সম্পাদনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে হাট ও বাজার ভূমিকা রাখে।

৮. বিনোদন ও মিলন কেন্দ্র : গ্রামের মানুষ অবসর সময়ে হাট ও বাজারে গিয়ে একে অন্যের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত, কুশল বিনিময়, আড্ডা, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে গল্পগুজব করে থাকে। এতে করে পারস্পরিক সৌহার্দ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং বন্ধন দৃঢ় হয়। এছাড়া গ্রামীণ হাট ও বাজারে মাঝে মধ্যে সার্কাস, ম্যাজিক শো, গানের আসর বসে। এসব আয়োজন বিনোদনের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের মনকে প্রফুল্ল রাখে।

৯. সামাজিক : গ্রামীণ হাট ও বাজারের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক সময় গ্রামের মানুষের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা, সামাজিক জটিলতা প্রভৃতি হাট ও বাজারে বসে সমাধান করা হয়। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রচার-প্রচারনা হাটে

ঢোল পিটিয়ে সবাইকে জানানো হয়। হাট ও বাজারে বিভিন্ন গ্রামের মানুষের আগমন ঘটায় এক গ্রামের সাথে অন্য গ্রামের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। এক গ্রামের বিপদে আপদে অন্যগ্রামের মানুষ ছুটে আসে।

পরিশেষে বলা যায় যে, গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে হাট ও বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যা জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	গ্রামীণ হাট ও বাজারের পার্থক্য নিরূপন করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি দ্রুত উন্নয়নশীল জনবহুল দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠি কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। গ্রামে উৎপাদিত কৃষি পণ্যদ্রব্যের উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রয় করা হয় গ্রামীণ হাট ও বাজারের মাধ্যমে। যা সারা দেশে সরবরাহ করা হয়। আবার গ্রামের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য এসব হাট ও বাজার থেকে ক্রয় করে। অর্থাৎ গ্রামীণ মানুষের পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান মাধ্যম এসব হাট ও বাজার। যা গ্রামীণ অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি গ্রামের মানুষের অবসর সময়ে মিলন কেন্দ্র এসব হাট ও বাজার। চায়ের দোকানে বা ফাঁকা জায়গায় বসে পারস্পরিক কুশল বিনিময়, পারিবারিক খোঁজখবর, সামাজিক বিষয়াদি সমাধানেরও অন্যতম মাধ্যম গ্রামীণ হাট ও বাজার। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ হাট ও বাজার আরো গতিশীল হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশের গ্রামীণ পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান উপায় কোনটি?

(ক) হাট (খ) শহর (গ) মহানগর (ঘ) রাজধানী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ থেকে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জনাব করিম একজন সফল কৃষক। তিনি তাঁর উৎপাদিত কৃষি ফসলের অতিরিক্ত অংশ গ্রামের পাশে হাটে বিক্রি করেন এবং প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করেন।

২। গ্রামীণ হাট সপ্তাহে সাধারণত কত দিন বসে?

(ক) ১/২দিন (খ) ২/৩ দিন (গ) ৩/৪ দিন (ঘ) ৪/৫ দিন

৩। গ্রামীণ হাটের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

i. পাইকারি ও খুচরা পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র

ii. অধিকাংশ ঘর কাঁচা

iii. খোলামেলা পরিবেশে স্বত:স্ফুর্তভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগম ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। গ্রামীণ বাজারের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

i. কিছু কিছু স্থায়ী দোকানঘর দেখা যায়

ii. সকালে শুরু হয়ে বিকেলে শেষ হয়

iii. সাধারণত পচনশীল পণ্যদ্রব্য যেমন- মাছ, মাংস ক্রয়-বিক্রয় হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৫ বাংলাদেশের নগরায়নের ধারা ও প্রধান নগরসমূহ (Urbanization Trend and Major Cities in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নগর ও নগরায়ন কী তা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের নগরায়নের ধারা সম্পর্কে জানবেন এবং
- প্রধান নগরগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের নগরায়নের ধারা

বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নশীল একটি দেশ। বর্তমানে জাতীয় উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নও দৃশ্যমান। যা নগরায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। এদেশ গ্রাম প্রধান হলেও নগরায়নের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। যেমন-বগুড়ার মহাস্থানগড়ের পুন্ড্রনগর, নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁও, নওগাঁর পাহাড়পুর, কুমিল্লার ময়নামতি প্রভৃতি। ১৬১০ সালে বাংলার রাজধানী ছিল জাহাঙ্গীরনগর যা বর্তমানে ঢাকা নামে পরিচিত। ব্রিটিশ আমলের ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পূর্ব বাংলার প্রথম জেলা হিসেবে যশোর শহরের সূচনা হয়। স্বাধীনতার পূর্বে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে সতেরটি বৃহত্তর জেলাসহ প্রায় ৯০টির মতো শহর ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর নব্বইের দশকের পর থেকে নগরায়নের হার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। একই সাথে বাড়তে থাকে নগর জনসংখ্যা। বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট বড় নগরের সংখ্যা প্রায় ৫৩৫টি।

নগর ও নগরায়ন : সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোনো একটি এলাকায় বসতি যখন উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত পানি, বিদ্যুৎ, বহুমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ ঘন সন্নিবিষ্ট বসতি গড়ে তোলে, তবে তাকে নগর বলে। নগরকে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, কোনো এলাকার অধিকাংশ অধিবাসী যদি দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে, এলাকাটি পরিচালনার জন্য একটি প্রশাসন ব্যবস্থা থাকে এবং নগরকেন্দ্র এলাকায় ৫,০০০ লোকের বসবাস থাকে। নগর এলাকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো অকৃষি যেমন- চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি পেশার লোকজনের আধিক্য। অর্থাৎ নগর এলাকায় পেশার বৈচিত্র্যতা দেখা যায়। পক্ষান্তরে, প্রক্রিয়ায় একটি এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠি নগর নাগরিকে পরিণত হয় তাই হলো নগরায়ন। অর্থাৎ এটি হলো একটি প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে ১,০০,০০০ অপেক্ষা কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট পৌর এলাকাকে শহর (Town) এবং ১,০০,০০০ থেকে ৪,৯৯,৯৯৯ জনসংখ্যা বিশিষ্ট পৌর বসতিগুলোকে নগর (City) বলে।

নগরায়ন দুইটি সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। প্রথমত, গ্রামীণ এলাকা থেকে পৌর এলাকায় মানুষের আগমন ঘটে এবং পৌর এলাকায় বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, নগরের সঙ্গে জড়িত সংস্কৃতির কতিপয় ধরণসহ গ্রামীণ এলাকায় পৌর প্রভাবের বিস্তার এবং এই প্রভাব প্রসার লাভ করার ফলে অতিমাত্রায় নগরায়িত সমাজে গ্রামীণ ও পৌর জনসংখ্যার মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য হ্রাস পায়।

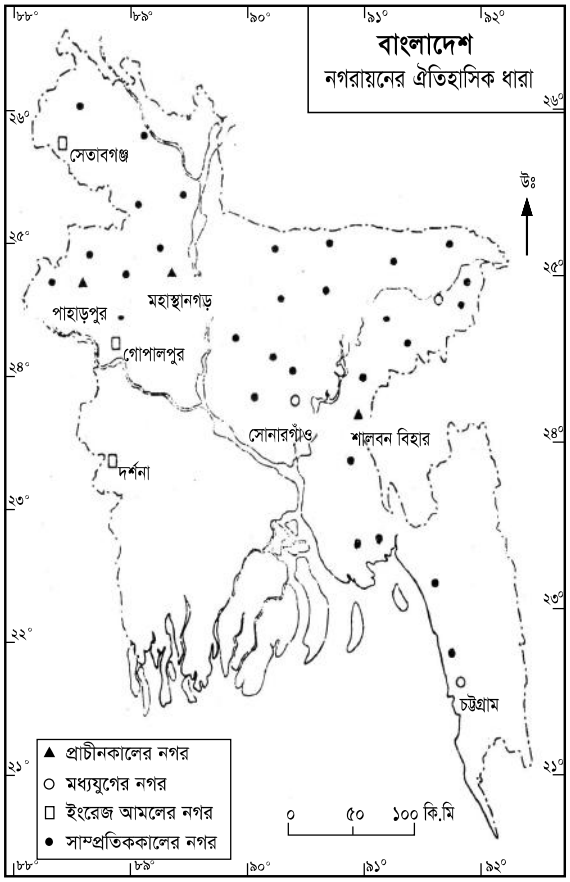

চিত্র ৪.৪.১ : বাংলাদেশের নগরায়নের ঐতিহাসিক ধারা

নগরীয় এলাকার বৈশিষ্ট্য : নগরের এলাকার কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে-

১. বসবাসকারী অধিবাসীদের পেশার বৈচিত্র্যতা।
২. অধিকাংশ লোকের অকৃষি কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা।
৩. কেন্দ্রীয়ভাবে পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকা।
৪. নগর পরিচালনায় প্রশাসন ব্যবস্থা থাকা।
৫. নগরের রাস্তাঘাট উন্নত হওয়া।
৬. পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা।
৭. প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা থাকা।
৮. বসবাসকারী নাগরিকের বিনোদনের ব্যবস্থা থাকা (যেমন-খেলাধূলা, থিয়েটার, সিনেমা হল ইত্যাদি)।
৯. ছোট বা বড় শিল্পকারখানার উপস্থিতি।
১০. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার।
১১. ঘরবাড়িগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট থাকা।
১২. গ্রামের তুলনায় উন্নতমানের অবকাঠামো (যেমন- পাঁকা, আধা পাঁকা ঘরের আধিক্য)।
১৩. বসবাসকারী অধিবাসীদের আধুনিক পোশাকের প্রতি আকৃষ্টতা।
১৪. দৈনন্দিন কাজকর্ম ও চালচলনে গতিশীলতা।
১৫. অনেক ক্ষেত্রে আয় দ্বারা সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হওয়া।
১৬. কর্তৃপক্ষকে ট্যাক্স প্রদান করা প্রভৃতি।

বাংলাদেশের প্রধান নগরসমূহ : বাংলাদেশে যেমন ঐতিহাসিক নগর রয়েছে তেমনি নতুন নতুন নগরও গড়ে উঠছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ নগরসমূহ বর্ণনা করা হলো :

ঢাকা : ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। এটি একটি ঐতিহাসিক শহর। জনসংখ্যা, আকার এবং আয়তনে দেশের বৃহত্তম এবং প্রধান শহর। এটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে শহরটি চতুর্দিকে ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। এটি প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রভূমি। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়সহ অসংখ্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিশুপার্ক, শপিংমল, জাদুঘর, সেনানিবাস, বিমানবন্দর, সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি রয়েছে। বর্তমানে ঢাকা শহরে দুইটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহের মধ্যে লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, সাত গম্বুজ মসজিদ, বাহাদুর শাহ পার্ক অন্যতম।

চট্টগ্রাম : ঢাকার পরই বৃহত্তম ও প্রাচীন নগর চট্টগ্রাম। এটি কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে দেশের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দরটি অবস্থিত। নগরটি বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার এবং বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত। চট্টগ্রাম শহরে অসংখ্য শিল্প-কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ক্যাডেট কলেজ, সমুদ্র সৈকত, বিমানবন্দর, সেনানিবাস প্রভৃতি রয়েছে। পাহাড় এবং সমুদ্র সৈকত নগরটিকে সৌন্দর্যময় করে তুলেছে। নগরটির সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সড়ক, নৌ এবং বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

রাজশাহী : বাংলাদেশের বৃহত্তম নগরগুলোর মধ্যে একটি রাজশাহী। এটি পদ্মা নদীর তীরে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। রাজশাহী এক সময় 'শিক্ষা নগরী' হিসেবে পরিচিত ছিল। সেনানিবাস, জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যাডেট কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি রয়েছে। শহরটি রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ঐতিহাসিক নির্দশনসমূহের মধ্যে রয়েছে শাহ মগদুমের মাজার, বরেন্দ্র জাদুঘর প্রভৃতি।

খুলনা : রূপসা এবং ভৈরব নদীর মিলনস্থলে খুলনা শহর অবস্থিত। এটি বিভাগীয় শহর এবং শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানকার শিল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে পাট, নিউজপ্রিন্ট, হার্ডবোর্ড, দিয়াশলাই প্রভৃতি। শহরটিতে বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেনানিবাস, হাসপাতাল, চিড়িয়াখানা, শিশুপার্ক, অফিস-আদালত প্রভৃতি রয়েছে। শহরটি সড়কপথ, রেলপথ এবং নৌপথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত।

সিলেট : সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত সিলেট একটি বিভাগীয় শহর। হযরত শাহজালাল (রাঃ) সহ ৩৬০ জন আউলিয়ার এ অঞ্চলে আগমন করে ধর্ম প্রচার করেন। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ক্যাডেট কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, বিমানবন্দর প্রভৃতি রয়েছে। সিলেট চা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এটি চায়ের দেশ নামেও

পরিচিত। উল্লেখযোগ্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে হযরত শাহজালাল (রঃ) এর মাজার, হযরত শাহ পরান (রঃ) মাজার, কীন ব্রিজ প্রভৃতি।

বরিশাল : বরিশাল শহরটি কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি একটি বিভাগীয় শহর। বাংলাদেশের প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে বরিশাল অন্যতম। এখানে দেশের বৃহত্তম নদীবন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত প্রভৃতি রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চল লবণ এবং মাছের জন্য বিখ্যাত। ঢাকাসহ দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোর সঙ্গে নৌপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত। এছাড়া সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

রংপুর : বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রাচীন জনপথ রংপুর। শহরটি তিস্তা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। এখানে মেডিকেল কলেজ, ক্যাডেট কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, সেনানিবাস, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি রয়েছে। শহরটি তামাক শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ঢাকাসহ অন্যান্য শহরের সাথে সড়ক ও রেল যোগাযোগ রয়েছে।

ময়মনসিংহ : ময়মনসিংহ জেলা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত। এটি একটি প্রাচীন জেলা শহর। ১৭৮৭ সালে জেলাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ বর্তমানে বিভাগীয় শহর। এ শহরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি রয়েছে।

কক্সবাজার : কক্সবাজার আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত এ জেলায় অবস্থিত। ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সমুদ্র সৈকতের তীর ঘেঁষে রয়েছে সংরক্ষিত বনভূমি। সমুদ্র সৈকতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পর্যটন শিল্প। শহরটিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

নারায়নগঞ্জ : শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে নারায়নগঞ্জ শহর অবস্থিত। এখানে দেশের অন্যতম নদীবন্দরটি অবস্থিত। এ শহর ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রসিদ্ধ। এখানে অসংখ্য শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। নারায়নগঞ্জ এক সময় পাটশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই শহরটি বর্তমানে একটি সিটি কর্পোরেশন।

গাজীপুর : গাজীপুর শহর রাজধানী ঢাকার অদূরে অবস্থিত। এটি একটি সিটি কর্পোরেশন। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র প্রভৃতি রয়েছে। শহরটিতে অসংখ্য শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে।

কুমিল্লা : কুমিল্লা শহর গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। এটি একটি সিটি কর্পোরেশন। শহরটিতে বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যাডেট কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেনানিবাস প্রভৃতি অবস্থিত। কুমিল্লা জেলা ঐতিহাসিকভাবে প্রসিদ্ধ।

বগুড়া : করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত বগুড়া একটি বৃহৎ শহর । এখানে মেডিকেল কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি রয়েছে। শহরের অদূরে মহাস্থানগড় ঐতিহাসিক নিদর্শনের জন্য বিখ্যাত।

যশোর : যশোর বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জেলা শহর। ১৮৭১ সালে যশোর জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ভৈরব নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। শহরে বিমানবন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত প্রভৃতি অবস্থিত। বেনাপোল স্থলবন্দর এ জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি শহরের গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। যশোর-কলকাতা একটি সড়কপথ রয়েছে। এ সড়কটি 'কলকাতা রোড' নামে পরিচিত।

দিনাজপুর : দিনাজপুর উত্তরাঞ্চলের বৃহৎ শহর। এটি পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত। এ শহরে একটি মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি রয়েছে। এ শহর সুগন্ধি চাল এবং লিচুর জন্য বিখ্যাত। শহরের অদূরে অবস্থিত রামসাগর ও কান্তজিউ মন্দির দর্শনীয় স্থান।

কুষ্টিয়া : কুষ্টিয়া শহর গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত। শহরের অদূরে অবস্থিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠীবাড়ি, লালনের আখড়া দর্শনীয় স্থান। এ শহরে মেডিকেল কলেজ, অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি রয়েছে। শহরটি একসময় বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল।

পাবনা : পাবনা একটি প্রাচীন জেলা শহর। এটি ইছামতি নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। দেশের একমাত্র মানসিক হাসপাতালটি হেমায়েতপুরে অবস্থিত। এছাড়া মেডিকেল কলেজ, ক্যাডেট কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত প্রভৃতি রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের প্রধান নগরসমূহ মানচিত্রে প্রদর্শন করুন।**

সারসংক্ষেপ

নগরায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ঐতিহাসিককাল থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নগর গড়ে উঠেছে। এদেশে বেশ কয়েকটি প্রাচীন নগরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম বগুড়ার মহাস্থানগড়ের পুন্ড্রনগর, নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁও, নওগাঁর পাহাড়পুর, কুমিল্লার ময়নামতি প্রভৃতি। বিভিন্ন সময়ে নগরায়ন ধীর গতিতে হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের পর থেকে তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ধারা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। এদেশে বিভিন্ন আয়তনের প্রায় ৫৩০ থেকে ৫৩৫ টি নগর রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বগুড়া প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি বাংলাদেশের প্রাচীন নগর?
(ক) ঢাকা (খ) ঠাকুরগাঁও (গ) নেত্রকোনা (ঘ) সিলেট

২। ঢাকা শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) শীতলক্ষ্যা (খ) বুড়িগঙ্গা (গ) ভৈরব (ঘ) কর্ণফুলী

৩। কোনটি বিভাগীয় শহর?
i. সিলেট ii. রাজশাহী iii. খুলনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। পাহাড়পুর কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) রাজশাহী (খ) বরিশাল (গ) নওগাঁ (ঘ) কুমিল্লা

পাঠ-৪.৬ বাংলাদেশের নগরায়নের সমস্যা ও সমাধান (Problem and Solution of Urbanization in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের নগরায়নের সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- নগরায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান বলতে পারবেন।

বাংলাদেশের নগরায়নের সমস্যা ও সমাধান

নগরায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় একটি অঞ্চল গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য থেকে পরিবর্তিত হয়। নগর এলাকার ক্রিয়াকলাপ, সেবা প্রদানের ধরণ, প্রশাসনিক কাজকর্ম, অবকাঠামোগত অবস্থা গ্রামীণ এলাকার তুলনায় ভিন্নতর এবং বৈচিত্র্যময় কর্মের সমাহার থাকে। নগরে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে ছুটে আসে। ফলে নগর এলাকায় জনসংখ্যার বাড়তি চাপ পরিলক্ষিত হয়। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য একটি নগর পরিকল্পিত হতে হয়। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে নগরায়ন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কিন্তু অপরিকল্পিত নগরায়ন বহুমুখী সমস্যা উদ্ভবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত নগরায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের নগরায়নের সমস্যা : বাংলাদেশে প্রধান নগরগুলোসহ বেশিরভাগ নগর নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন। নিম্নে নগরগুলোর উল্লেখযোগ্য সমস্যাসমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. অতিরিক্তি জনসংখ্যা : নগরগুলোর অন্যতম সমস্যা ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত জনসংখ্যা। যেমন- ঢাকা শহরের জনসংখ্যা। প্রতিনিয়ত বড় বড় শহরগুলোতে মানুষ কর্মের সন্ধানসহ বহুমুখী কাজে ছুটছে। গ্রাম থেকে এভাবে প্রচুর মানুষের নিয়মিত অভিগমনের ফলে নগরগুলোর জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

২. অপরিকল্পিত নগরায়ন : বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো নগর পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে উঠেছে। এতে বিনষ্ট হচ্ছে কৃষি জমি এবং ব্যাহত হচ্ছে ফসল উৎপাদন। এছাড়া সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই যত্রতত্র ভবন নির্মাণ অপরিকল্পিত নগরায়নের অন্যতম কারণ। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সরকার পরিকল্পিত নগরায়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

৩. কৃষি জমি হ্রাস : নগরায়নের সমস্যাসমূহের মধ্যে অন্যতম কৃষি জমি হ্রাস। নতুন নতুন ঘরবাড়ি, অবকাঠামো, নাগরিক সুযোগ-সুবিধার জন্য কৃষি জমির একটি অংশ ব্যবহৃত হয়। এতে কৃষি জমি হ্রাস পেয়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলে।

৪. বাসস্থান সংকট : বৃহৎ নগরগুলোতে অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত কারণে চাহিদামতো বাসস্থানের সংকট রয়েছে। উপরন্তু বিভিন্ন প্রয়োজনে নগরে ছুটে আসা মানুষ বাসস্থান সংকটকে বাড়িয়ে তুলছে। ফলে নগরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির একটি অংশ স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যা আমাদের দেশে নগরায়নের একটি বড় সমস্যা।

৫. বস্তি : বাংলাদেশের প্রধান নগরগুলোর একটি বিশেষ দৃশ্য বস্তি। গ্রামের ভূমিহীন, দরিদ্র, নদীভাঙ্গনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষ কর্মের সন্ধানে নগরে ছুটে আসে। এতে নগর জনসংখ্যার উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। এসব মানুষ এসে বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠা বস্তিতে বসবাস করে। অস্বাস্থ্যকর এসব নগর বস্তি পরিবেশেরও ক্ষতি করে। যেমন- ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগরে বহু মানুষ বস্তিতে বসবাস করে।

৬. বেকারত্ব বৃদ্ধি : নগর এলাকার যেমন বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়, ঠিক তেমনি অতিরিক্ত লোকের কর্মসংস্থান করতে না পারলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের প্রধান নগরগুলোর অন্যতম সমস্যা বেকারত্ব। নগর এলাকায় চাহিদার সাথে সংগতি না রেখে অবাধে লোকের আগমন ঘটায় এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

৭. যাতায়াত ব্যবস্থা : আমাদের দেশে নগর চাহিদার তুলনায় রাস্তাঘাটের পরিমাণ অনেক কম। কোনো একটি শহরে মোট আয়তনের ২৫% রাস্তাঘাট এবং উন্মুক্ত জায়গা হিসেবে ব্যবহারের নিয়ম থাকালেও আমাদের দেশে তা মানা হয় না। ফলে অল্পসংখ্যক রাস্তাঘাট দিয়ে অধিক সংখ্যক মানুষ ও যানবাহন যাতায়াত করতে হয়। এতে করে বড় বড় শহরগুলোতে যানজট লেগেই থাকে। উদাহরণ হিসেবে রাজধানী ঢাকা বা বন্দরনগরী চট্টগ্রামের কথা বলা যেতে পারে। এসব শহরে অনেক সময় ঘন্টার পর ঘন্টা যানজটে আটকে থাকতে হয়।

৮. ব্যক্তিগত যানবাহনের আধিক্য : বাংলাদেশের প্রধান নগরগুলোতে যানবাহনের আধিক্য লক্ষ্যণীয়। গণ পরিবহনের তুলনায় ব্যক্তিগত যানবাহনের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ার সঙ্গে অবাধে পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, সীমা, অ্যাসবেস্টস্, পারদ, নিকেল প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এতে সর্দি, কাঁশি, হাঁপানি, চর্মরোগসহ অন্যান্য রোগের মাত্রা বেড়ে যায়।

৯. জলাবদ্ধতা : কোনো কোনো শহরে জলাবদ্ধতা নাগরিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। এসব শহরে পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় অল্প বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নারায়নগঞ্জ শহরের জলাবদ্ধতার কথা বলা যেতে পারে।

১০. শিক্ষাক্ষেত্রে : আমাদের দেশের নগরগুলোতে চাহিদার তুলনায় ভালো মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংকট রয়েছে। যদিও নতুন নতুন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। শিক্ষক এবং অবকাঠামোর তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে লেখাপড়ার মানের উপর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে শিক্ষার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

১১. চিকিৎসাক্ষেত্রে : শহরগুলোতে চিকিৎসা ব্যবস্থা চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃদ্ধি করা বেশ দূরুহ কাজ। গ্রামে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবার ঘাটতি থাকায় অনেকেই চিকিৎসার জন্য শহরে ছুটে আসে। এছাড়া শহরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা আবশ্যক। বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হওয়ায় সকলের পক্ষে তা বহন করা সম্ভব হয় না।

১২. জ্বালানি : বড় বড় শহরগুলোতে জ্বালানি হিসেবে সাধারণত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এতে করে সীমিত পরিমাণ গ্যাসের উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশে মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ৩৮.০২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ মাত্র ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সীমিত গ্যাসের অতিরিক্ত ব্যবহার করলে তা দ্রুত ফুরিয়ে যাবে। যা জ্বালানি সংকটকে প্রকট করবে।

১৩. বর্জ্য নিষ্কাশন : নগর এলাকায় সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু আমাদের দেশে নগরগুলোতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অসচেতনতা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে অনেক সময় যত্রতত্র বর্জ্য পড়ে থাকে। যেমন- নগরীর বিভিন্ন সড়ক, রাস্তা, গলি, জলাধার, খোলা মাঠে বর্জ্যের স্তুপ পড়ে থাকতে দেখা যায়। এতে শহরে দুর্গন্ধময় পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং রোগবালাই দেখা দেয়।

১৪. চিত্ত বিনোদন সমস্যা : আমাদের দেশে নগরায়নের ক্ষেত্রে বিনোদনের অভাব দেখা যায়। প্রয়োজনীয় জমি এবং সঠিক পরিকল্পনার অভাবে নাগরিকদের জন্য পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা যায় না বললেই চলে। একটি সুস্থ ও সবল নাগরিক সমাজের জন্য বিনোদন প্রয়োজনীয় উপাদান। বিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদির ঘাটতি রয়েছে।

১৫. নাগরিক সুযোগ-সুবিধা : শহরের আবশ্যকীয় সেবা গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন প্রভৃতি। প্রায় নগরগুলোতে এসব নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হিমসিম খাচ্ছে। ফলে দেখা দেয় নাগরিক দুর্ভোগ যা আমাদের দেশের নগরায়নের অন্যতম দুর্বলতা।

১৬. সামাজিক বন্ধনে শিথিলতা : নগর জীবনে মানুষ কর্ম ব্যবস্থা থাকে। একজন আরেকজনের সাথে সরাসরি দেখা-সাক্ষাত যেমন- বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি বা সমাজে বসবাসকারী লোকের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ কমে গেলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসায় ব্যাঘাত ঘটায়। এতে করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায়। এ প্রবণতা আমাদের দেশে নগরায়নে ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে করা হয়।

১৭. অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড : নগর এলাকায় বসবাসরত সবার জন্য কর্মসংস্থান করতে না পারলে বা আধিপত্য বিস্তারের অপচেষ্টার কারণে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে পারে। এতে করে নগর এলাকার আইন-শৃঙ্খলার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, প্রতারণা, মারামারি, অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। এসব ঘটনা নাগরিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

১৮. পরিবেশ দূষণঃ অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে পরিবেশের উপর প্রভাব পড়ে। শিল্পায়ন শিল্পবর্জ্য, জীবাশ্ম জ্বালানি, অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন, যানবাহনের শব্দ, নতুন স্থাপনা নির্মাণ সামগ্রী প্রস্তুতের শব্দ নগর পরিবেশকে দূষিত করে। এতে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, মৃত্তিকা দূষণ, শব্দ দূষণ দেখা দেয় এবং বিভিন্ন রোগবালাই সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে নগরায়নের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সমস্যাগুলো ছাড়াও নিরাপত্তা, অগ্নি দুর্ঘটনা, সড়ক দুর্ঘটনা প্রভৃতি দেখা যায়।

নগর সমস্যা সমাধানের উপায় : বাংলাদেশের নগরায়নে যেসব সমস্যা দেখা যায় সেসব সমস্যা সমাধানে কতিপয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। এসব পদক্ষেপ একটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নগর গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১. পরিকল্পিত পরিকল্পনা : একটি নগর গড়ে উঠার পূর্বেই উক্ত নগরের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। নগরের কোথায় কোন স্থাপনা গড়ে উঠবে, লোক ধারণ ক্ষমতা কত হবে, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা কতটুকু নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এসব বিষয়ে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যমান নগরগুলো যতদূর সম্ভব সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় একটি কাঠামো তৈরি করে তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

২. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ : প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শহরের উপর চাপ কমাতে হবে। এজন্য সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কার্যাদি যাতে উপজেলা পর্যায়েই সমাধান করা যায় সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে করে গ্রামের মানুষ শহরে আসার প্রবনতা অনেক হ্রাস পাবে।

৩. কর্মসংস্থান : গ্রামীণ দরিদ্র, বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রামেই করতে হবে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। এতে করে গ্রামীণ এসব লোকজনের শহরে কর্মের সন্ধানে যাওয়ার প্রবনতা কমে যাবে। একইসাথে গ্রামীণ অর্থনীতি গতিশীল হবে যা জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

৪. আবাসন : নগরে বসবাসকারী সকল নাগরিকের আবাসনের জন্য আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে ভবন নির্মাণ করতে হবে। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ করে স্বল্প টাকায় থাকার ব্যবস্থাসহ ভবিষ্যতে মালিকানা অর্জনের পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া আবাসিক এলাকা পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে। আবাসিক এলাকার বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

৫. নগর পরিবহন : নগর পরিবহন ব্যবস্থায় নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ, বিদ্যমান রাস্তার সম্প্রসারণ ও অবৈধ দখল মুক্তকরণ, বহুতল বাস সংযোজন, প্রাইভেট গাড়ির নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ পার্কিং রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অনেক ভবনে অতিথিদের গাড়ি বাইরে রাখার জন্য সাইনবোর্ড টানানো থাকে। এতে করে অতিথির গাড়ি রাস্তায় পার্কিং এর মাধ্যমে যানজট এবং দুর্ভোগ তৈরি করে। এ ধরনের সাইনবোর্ড যাতে কোনো ভবন মালিক টানাতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে ভবন মালিকদের এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

৬. পানীয় জলের সরবরাহ : শহরের মানুষের পর্যাপ্ত সুপেয় পানি সরবরাহ থাকতে হবে। খরা মৌসুমেও যাতে পানির সংকট না হয় সেলক্ষ্যে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। পানি শোধনাগারের সংখ্যা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সরবরাহ লাইন সম্প্রসারণ করতে হবে। পানির অপচয় রোধে নাগরিকদের নিজে সচেতন হতে হবে এবং অন্যকে সচেতন করতে হবে।

৭. পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি নিষ্কাশন : নগর এলাকায় নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে হবে। বড় বড় নগরগুলোর জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়মিত তদারকি করতে হবে। পানি নিষ্কাশনের ড্রেন যাতে ময়লা-আবর্জনা পড়ে বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। চাহিদার সাথে সংঘতি রেখে নতুন নতুন পানি নিষ্কাশন লাইন স্থাপন করতে হবে।

৮. শিক্ষা ও চিকিৎসা : গ্রামীণ মানুষের শহরমুখীতার অন্যতম কারণ শিক্ষা ও চিকিৎসা। গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক, অবকাঠামো এবং গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া শিক্ষকদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানে পাঠদানে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষার গুণগত মান এবং প্রতিষ্ঠান উন্নত হলে শহরে আসার প্রয়োজন হবে না। একই সাথে নগরবাসীর জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। এছাড়া আমাদের দেশের গ্রামীণ চিকিৎসাসেবা পর্যাপ্ত না হওয়ায় মানুষ বাধ্য হয়ে শহরে গমন করে। তাই গ্রামীণ এলাকায় সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালে সুলভে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। চিকিৎসাকে মানব সেবা হিসেবে সবাইকে গ্রহণ করতে হবে।

৯. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ : নগর এলাকার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত পর্যন্ত জনসংখ্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হলেও নিম্ন আয়ের মানুষজন এখনো সে পর্যায়ে যেতে পারেনি। তাই নিম্ন আয়ের মানুষদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া গ্রাম থেকে শহরমুখী মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে গ্রামেও শহরের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করতে হবে।

১০. আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ : নগর এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পর্যাপ্ত সদস্য নিয়োগ করতে হবে। একই সাথে নাগরিকদের সচেতন হতে হবে।

১১. মাদক নিয়ন্ত্রক : শহর এলাকায় মাদকের বিস্তার রোধে এর উৎস নির্মুল করতে হবে। শহরে যাতে অবৈধ মাদক প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সংশ্লিষ্টদের তৎপর থাকতে হবে।

১২. বিনোদনের ব্যবস্থা : নগরগুলোতে জনসংখ্যার আকার অনুযায়ী বিনোদনের জন্য পার্ক, থিয়েটার ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া শারীরিক সুস্থতার জন্য খেলাধূলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নগরগুলোর খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদির অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে। একই সাথে খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩. সামাজিক নিরাপত্তা : নগর এলাকায় বসবাসরত সকল নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সিনিয়র নাগরিক, বেকার, নির্ভলশীল, নিম্ন আয়ের মানুষ সবার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে প্রসারিত করতে হবে। এলক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে।

১৪. দূষণ প্রতিরোধ : নগর এলাকায় অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে পরিবেশ দূষিত হয়। শিল্পকারখানা ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া, গৃহস্থালি বর্জ্য ইত্যাদির পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা করতে হবে। এতে নগর পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

১৫. বনায়ন : নগর এলাকায় বৃক্ষের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি ভবনের পাশে বৃক্ষরোপন নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। এলক্ষ্যে নগরবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার নিজ শহর বা নিকটবর্তী কোনো নগরের বিদ্যমান সমস্যা এবং তা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে নগরায়নের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিভিন্ন নাগরিক অসুবিধা। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা চাপ, বাসস্থান সংকট, বস্তি, বেকারত্ব, যাতায়াত, জলাবদ্ধতা, শিক্ষা, চিকিৎসা, আইনশৃঙ্খলা, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার নাগরিক সুযোগ-সুবিধা যেমন-পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সকল নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করা যায় না। তাই এসব সমস্যা সমাধান করে প্রতিটি নগরকে পরিকল্পিত এবং পরিবেশসম্মত নগরে পরিণত করার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ প্রয়োজন। এসব পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পরিকল্পিত পরিকল্পনা, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, কর্মসংস্থান, আবাসন, নগর পরিবহন, পানীয় জলের সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি নিষ্কাশন, শিক্ষা ও চিকিৎসা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, মাদক নিয়ন্ত্রক, বিনোদনের ব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা, দূষণ প্রতিরোধ, বনায়ন প্রভৃতি। নগরায়ন সমস্যার সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবসম্মত প্রয়োগ সুষ্ঠু নগরায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। একটি শহরের মোট আয়তনের শতকরা কতভাগ রাস্তাঘাট ও উন্মুক্ত জায়গা থাকা আবশ্যক ?

(ক) ২০% (খ) ২৫% (গ) ৩০% (ঘ) ৩৫%

৩। বাংলাদেশে নগরায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যা কোনটি ?

i. অতিরিক্ত জনসংখার চাপ ii. কৃষিজমি হ্রাস iii. রাস্তাঘাট সংকট

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। নগর সমস্যা সমাধানের উপায় কোনটি?

i. সুষ্ঠু পরিকল্পনা ii. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ iii. বেকারত্ব বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

কবিতা গ্রামে বসবাস করেন। তাঁর গ্রামের অধিকাংশ মানুষের ঘরবাড়ি কাঁচা ও টিনের তৈরি। মাঝে মধ্যে দু'একটি সেমি পাকা ও পাকা ঘরবাড়ি রয়েছে। তিনি শহরে এসে এর ভিন্ন চিত্র দেখলেন। গ্রাম এবং শহরের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলেন।

ক. বসতি কত প্রকার ও কী কী?
খ. অনুকেন্দ্রিক বসতি বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রাম ও শহরের ঘরবাড়ির ধরণ ভিন্ন হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. বসতি স্থাপনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

নিচের চিত্রটি দেখুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

চিত্র ১

চিত্র ২

ক. পরিবেশের সাথে মানুষের অভিযোজনের প্রথম পদক্ষেপ কী?
খ. নগর ও মহানগর বলতে কী বুঝায়?
গ. চিত্র ১ এ উল্লিখিত ছবির আলোকে বাংলাদেশের উক্ত বসতির শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।
ঘ. চিত্র ২ এর আলোকে বাংলাদেশের নগরসমূহের প্রধান সমস্যাসমূহ তুলে ধরে তা সমাধানের উপায় বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১ :	১. ক	২. গ	৩. ঘ	৪. খ	৫. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২ :	১. ক	২. গ	৩. খ	৪. খ	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩ :	১. গ	২. ঘ	৩. ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪ :	১. ক	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৫ :	১. ক	২. খ	৩. ঘ	৪. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৬ :	১. খ	২. ঘ	৩. ক		

পাঠ-৪.৭ বাংলাদেশের প্রধান নগরসমূহ মানচিত্রে প্রদর্শন এবং নগর জনসংখ্যার ভিন্নতা বর্ণনাকরণ (Presentation of Major Cities of Bangladesh in Map and Differentiation of Urban Population)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের প্রধান নগর মানচিত্রে দেখাতে পারবেন এবং
- উক্ত নগরসমূহের জনসংখ্যার ভিন্নতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বাংলাদেশের প্রধান নগরসমূহ মানচিত্রে প্রদর্শন

মানচিত্রে ভৌগোলিক তথ্য উপস্থাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল রয়েছে। এসব পদ্ধতি বা কৌশলের মধ্যে বর্গ পদ্ধতি তুলনামূলক সহজ। কোনো স্থানের জনসংখ্যা, ভূমি ব্যবহার, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ইত্যাদি আনুপাতিক হারে প্রদর্শনের জন্য এ কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই পাঠে বাংলাদেশের কয়েকটি নগরের জনসংখ্যা বর্গ পদ্ধতিতে মানচিত্রে প্রদর্শন এবং ভিন্নতা বর্ণনা করা হয়েছে।

বর্গ পদ্ধতি (Square Method) : ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের কয়েকটি নগরের জনসংখ্যা সারণি ৪.৭.১ এ দেখানো হলো। একে বর্গ পদ্ধতিতে বাংলাদেশের মানচিত্রে প্রদর্শন করতে হবে।

সারণি ৪.৭.১ : বাংলাদেশের কয়েকটি নগরের জনসংখ্যা-২০১১

নগর	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	নগর	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
ঢাকা	১৪.১৭	সিলেট	০.৫৩
চট্টগ্রাম	৩.৭২	ময়মনসিংহ	০.৩৯
রাজশাহী	১.০৫	রংপুর	০.৩১
খুলনা	০.৬৮		

উৎস : বিবিএস, ২০১৪

বর্গ পদ্ধতিতে অঙ্কন : আমরা জানি, বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য সমান। বর্গ পদ্ধতিতে উপাত্ত প্রদর্শনের জন্য প্রতিটি নগরের জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বকারী বর্গগুলোর বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে তা নির্ণয়ের জন্য প্রতি বর্গসেন্টিমিটার বা বর্গইঞ্চিতে এটি জনসংখ্যা ধরতে হবে। এখানে প্রতিটি নগরের ৩ মিলিয়ন লোককে ১ বর্গসেন্টিমিটার হিসেবে ধরা হলো। এখন প্রদত্ত নগরগুলোর জনসংখ্যার বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করি। এক্ষেত্রে নগরের মোট জনসংখ্যাকে ৩ মিলিয়ন দিয়ে ভাগ করলেই বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে। যেহেতু বর্গক্ষেত্রের সকল বাহুর দৈর্ঘ্য সমান সেহেতু একটি বাহুর দৈর্ঘ্য হলেই বর্গক্ষেত্রটি অঙ্কন করা যাবে।

ঢাকা মহানগরের ১৪.১৭ মিলিয়ন লোকের জন্য বাহুর দৈর্ঘ্য $= \frac{১ \times ১৪.১৭}{৩} = ৪.৭২$ সেন্টিমিটার

চট্টগ্রাম নগরের ৩.৭২ মিলিয়ন লোকের জন্য বাহুর দৈর্ঘ্য $= \frac{১ \times ৩.৭২}{৩} = ১.২৪$ সেন্টিমিটার

রাজশাহী নগরের ১.০৫ মিলিয়ন লোকের জন্য বাহুর দৈর্ঘ্য $= \frac{১ \times ১.০৫}{৩} = ০.৩৫$ সেন্টিমিটার

খুলনা নগরের ০.৬৮ মিলিয়ন লোকের জন্য বাহুর দৈর্ঘ্য $= \frac{১ \times ০.৬৮}{৩} = ০.২৩$ সেন্টিমিটার

সিলেট নগরের ০.৫৩ মিলিয়ন লোকের জন্য বাহুর দৈর্ঘ্য $= \frac{১ \times ০.৫৩}{৩} = ০.১৮$ সেন্টিমিটার

ময়মনসিংহ নগরের ০.৩৯ মিলিয়ন লোকের জন্য বাহুর দৈর্ঘ্য $= \frac{১ \times ০.৩৯}{৩} = ০.১৩$ সেন্টিমিটার

রংপুর নগরের ০.৩১ মিলিয়ন লোকের জন্য বাহুর দৈর্ঘ্য $= \frac{১ \times ০.৩১}{৩} = ০.১০$ সেন্টিমিটার

এখন, প্রত্যেক নগরের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বাহুর দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মানচিত্রে নগরগুলোর জনসংখ্যা দেখানোর জন্য বর্গ অঙ্কন করি।

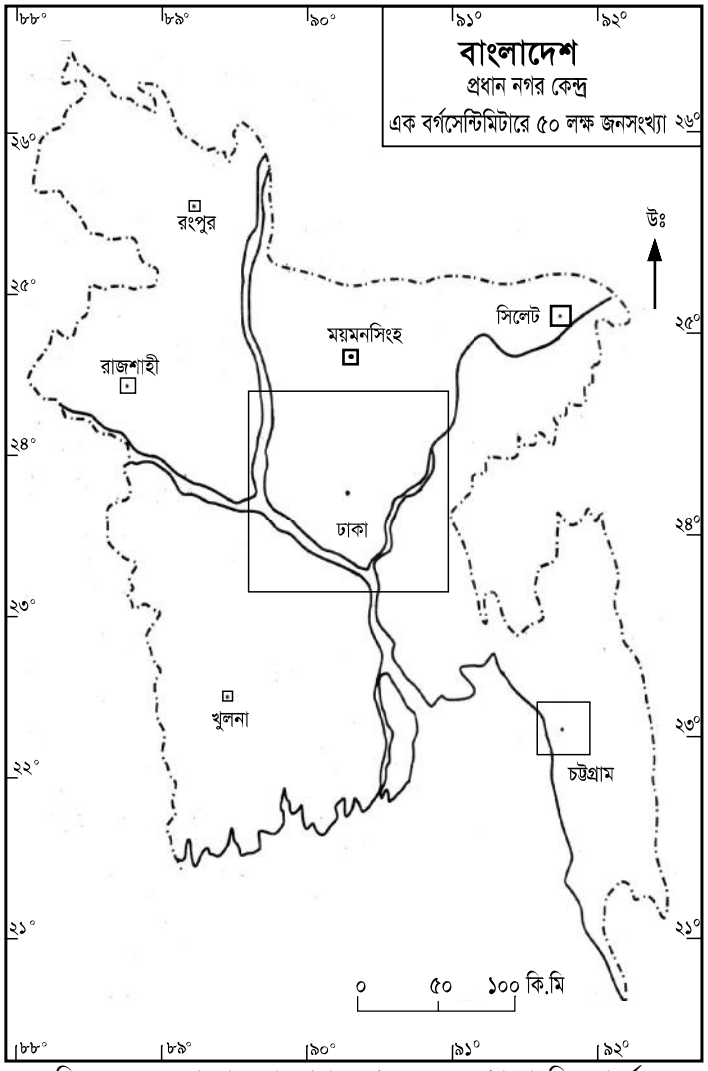

চিত্র ৪.৭.১ : বাংলাদেশের প্রধান নগরের জনসংখ্যা মানচিত্রে প্রদর্শন

বিশ্লেষণ : মানচিত্রে প্রদর্শিত বর্গক্ষেত্র অনুযায়ী ঢাকা শহরের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এটি বাংলাদেশের রাজধানী এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে অসংখ্য শিল্প-কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। ফলে স্বাভাবিকভাবে ঢাকা মহানগরে জনসংখ্যার চাপ বেশি। এছাড়া দেশের সকল জেলা শহরের সাথে যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে সড়ক, রেল, নৌ বা বিমানপথের যেকোনো এক বা একাধিক অথবা সবগুলো ব্যবস্থা রয়েছে। ঢাকার পরই রয়েছে চট্টগ্রাম নগরের অবস্থান। এটি দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং বন্দরনগরী হিসেবে পরিচিত। এখানে সমুদ্রবন্দর থাকায় বিদেশে পণ্য আমদানি-রপ্তানির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকায় চট্টগ্রামে জনসংখ্যা অধিক। ফলে বর্গক্ষেত্রটির আকারও বড়। মানচিত্রে প্রদর্শিত বর্গক্ষেত্রের আকার দেখে বুঝা যাচ্ছে নগরগুলোর জনসংখ্যার বিন্যাস। এতে নগরগুলোর জনসংখ্যার ভিন্নতা সহজেই পরিমাপ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের নগর জনসংখ্যা মানচিত্রে দেখানোর জন্য বর্গ পদ্ধতিতে অনুশীলন করুন।